সূচিপত্র

পুঁথি পালার উত্তর আধুনিক । দেবদত্ত গুপ্ত ৯

শিবসদাগর ১৩
রং বেরং ২৫
নোয়ার কিস্তি ৫৩
রাসধারি ৮৩
ধরা-পড়া ১০৫
এসপার-ওসপার ১২১

পুঁথি পালার উত্তর আধুনিক

দেবদত্ত গুপ্ত

পুঁথি পালার অথবা নাটক নাটিকার লেখক অবনীন্দ্রনাথ এক অন্য চরিত্রের কথক। কারণ তাঁর লিখিত পুঁথি পালা বা নাটক নাটিকার আড়ালে কার্যত রয়ে গিয়েছে বাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক বিপুল সম্পদ। ব্রত কথার বয়ান, পালা পার্ব্বনের নানা আচার অনুষ্ঠানের বিবিধ আঙ্গিক, পাঁচালী পড়ার ঢং, লোকের দেশী ভাষায় কথা বলার মেজাজ, বাংলার লোক সঙ্গীত, ফিরিওয়ালার ডাক ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক অন্য ভাষার ছন্দ। বিবিধ উপাদানকে পালা, পুঁথি বা নাটক নাটিকার নানা জায়গায় নিপুণ ভাবে ব্যবহার করার এমন পন্থা আমাদের অবাক করে পলে পলে। কারণ যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির জমিতে তখন পুষ্ট হচ্ছে বাংলার নব জাগরণের বিবিধি ভাবনা, যে বাড়ির সবার মধ্যেই তখন বইছে ধ্রুপদী মননের প্রবল ঢেউ, যে বাড়ি তখন উপনিষদের বানী, বেদের মন্ত্র, কিম্বা দেশী-বিদেশী ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিপুল চর্চার মাধ্যমে বাংলাকে নব নব দিশায় এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র দিয়ে চলছে সেরকম একটা সময় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীতে যেন সেই অর্থে কোথাও ধ্রুপদীকে আশ্রয় করতে চাইলেন না। বলতে গেলে ধ্রুপদীর গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। এমন ধ্রুপদী ঘেরাটোপ থেকে বেড়িয়ে আসাটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু কোন পথে হাঁটলেন অবনীন্দ্রনাথ? দেখা গেল প্রাথমিক ভাবে বাংলার যাত্রাপালার আঙ্গিক তাঁর লেখনীতে ছায়া বিস্তার করল বিপুল প্রভাবে। তাই বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যও অবনীন্দ্রনাথের কলমে এই পুঁথি পালার মধ্যে নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিলো। আজকের দিনে যখন উত্তর আধুনিক সাহিত্য চর্চা ধ্রুপদী গণ্ডীর বাধা ধরা গত থেকে সাহিত্য চিন্তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলছে ও সেই মুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার একটা দীর্ঘ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে সেরকম একটা সমকালে দাঁড়িয়ে অবনীন্দ্র সাহিত্যের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা উত্তর আধুনিকতার প্রেক্ষাপটেই বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। সুতরাং জানার দরকার হয় যে অবনীন্দ্রনাথ লিখিত এই পালা পুঁথি বা নাটিকা গুলির চরিত্রটা কি রকম। প্রথমে ধরা যাক মারুতির পুঁথির কথা। ১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দের মৌচাক পত্রিকায় এই রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কাহিনীর একটা

জায়গায় পবন দেবতা তাঁর ডানার পাখনা বন্ধ করে গোম হয়ে বসে আছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন পবনের এমন কাণ্ডে ত্রিভুবনে রব উঠেছে, লোকে দম ফেটে মরছে কারণ 'শ্বাস পবন সে জীবন, পবন না হলে বাঁচার কী উপায়'। এবার পালার ছন্দে লিখছেন 'স্থাবর জঙ্গমাদি মরে যত জীব/মুনি ঋষি অচেতন হাপাচ্ছেন শিব/ইন্দ্র আদিম দম বন্ধ-নাড়ি ছাড়ো ছাড়ো/সৃষ্টি নাশ হয় দেখি চিন্তা বিধাতারও'/... সেই সঙ্গে ব্রহ্মার হাঁস মানস সরোবরে হাপাচ্ছেন। এমন রামায়ণী ছন্দ নিয়ে অনায়াসে খেলতে পারতেন অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গে হাস্য রসের চূড়ান্ত ব্যবহার। পাশাপাশি লিখছেন এমন পুঁথি সভায় আনার আগে আবার 'বাল্য ভোগ' দিতে হয়। ফলে মজার এক রামায়ণের অংশ তৈরি হতে হতেই বাংলার ঘর গেরস্থলির পুজো পালার যে নিজস্ব বাল্য ভোগের নিয়ম সেটাও ঢুকে পড়লো এখানে। গ্রাম জীবনের চর্যাকে নিজের পালায় ধরে রাখলেন অবনীন্দ্রনাথ। সাহিত্য রচনায় এই পট পরিবর্তনটাই সেদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ছিল। চাঁই বুড়োর পুঁথিতে সরাসরি নিজের আমলের চারপাশে। যে কারণে লঙ্কায় একটা ঘরোয়া আলোচনায় কন্যা দান করতে গেলে কি কি লাগে তার একটা তালিকা দিচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'সুট-সার্ট' মানে স্যুট এবং সার্ট, 'বেসলেট' মানে ব্রেসলেট, 'সেপটিপিন' মানে সেফটি পিন, 'এসেন' মানে এসেন্স সব মিলিয়ে বনেদি ঘরের অন্দর মহলও উঠে আসছে পালায়। বলা যেতে পারে অসামান্য একটা সমকালীনতা কাহিনীর পরতে পরতে। এই সমকালের ছবিই অবনীন্দ্র লেখনীর মূল আভিজাত্য। আবার ওই পালাতেই তুলে আনলেন গ্রাম বাংলার ঘরোয়া 'বচন'। যেমন 'পতিহীনা মানুষীর একদিন একাদশী/পতিখাকী রাক্ষুসীর পাঁচ দিন পঞ্চদশী'...। অথবা 'যেদিন বিয়ে সেই দিনেই রাড়ি/দোয়াদশীতে চান ঘোড়ার ডিমের তরকারি'/এই যে বচনের ব্যাবহার তা বাঙলা সাহিত্য চর্চায় সেদিন আবশ্যিক ভাবেই বিরল। উত্তর আধুনিক সাহিত্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমন উপাদান গ্রহনের সপক্ষে সোচ্চার। সেই রাস্তা বহু যুগ আগেই নিয়ে নিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার ব্রত নিয়ে বড় লেখাও লিখে ফেললেন। এবার মনে হতে লাগলো যে বাগেশ্বরীর ধ্রুপদী মেজাজ থেকে নেমে এলেন বাংলার মাটিতে। সঙ্গে সমকালের কলকাতা নগরের বিপুল নাগরিক মেজাজের উপাদান গেল মিশে। আবার দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুমার ঝুলিও বাদ পড়লো না। তাই তো এই পালাতে লিখতে পারলেন 'ছাগলে মুড়ায় নটে-শাক পাতা দাঁত ওঠার আগে' ইত্যাদি। এমন ইতিহাস বিরল। এটিও ১৩৪৬ সালের মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়েছিল। কিন্তু পোড়া লঙ্কার পুঁথি নামে এর প্রকাশ ঘটে।

মহাবীরের পুঁথি প্রকাশিত হয় রঙ মশাল পত্রিকায়। সেখানেও রয়েছে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা। ১৩৪৮ থেকে ১৩৫০ সালের মধ্যে এই পুঁথি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। এই পুঁথি একেবারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের টুকরো বসিয়ে বসিয়ে লেখার মতো করে লেখা। সঙ্গে গদ্যের অংশ লিখেছেন জুড়ি দোহারের কথা বলার মতো। এই পুঁথিতে ফিরি ওয়ালার ডাক হাজির হয়েছে লঙ্কার রাক্ষসীদের গানে। যেমন 'সি-সী-বো-তো-ল-বি-ক-রী-। পে-ত-ল-কা-সা-বা-স-ন-কো-স-ন'। ও-জোন-দ-রে-না-না-ধা-তুময়-ব-স-তু, পু-রা-ত-ন-কা-গ-জা-দী-ব-দ-ল-দী-তে-প্র-স-তু-ত-আ-ছি-আ-নে-ন-ক-রে-ন- পুরাতন বর্জন-নূতন- অর্জন...'। বলতেই হয় যেমন দুরন্ত এক্সপেরিমেন্টে তেমনই অসামান্য নাগরিকতা। কিন্তু শিব সদাগর থেকে এসপার ওসপার পর্যন্ত পালা অন্য ছন্দে এগিয়ে চলে। এগুলি কার্যত নাটিকা। এখানে বাংলার লোক গানের অনুপ্রবেশ ঘটে নিজের চাহিদা অনুসারে। যেমন শিব সদাগরে আমরা দেখছি, 'শিব সদাগর তুই নি সোদর ভাই/মেঘ রাজারে তুই নি সোদর ভাই/ এক ঝুড়ি মেঘ দেও/ভিজ্জে ঘর যাই'। সরাসরি একটু অদল বদল করে ঢুকে পড়লো বাংলার লোক গান। এই অসামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে আরেকটা ব্যাপার মনে আসে। তা হল সেই সময় একদিকে ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছেন পল্লী কবি জসীম উদ্দিন, রবীন্দ্রনাথ লোক গান ভেঙে গান লিখছেন, গুরুসদয় দত্ত লোক শিল্প নিয়ে ভাবছেন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় লোকায়ত নিয়ে চর্চা করছেন, সব মিলিয়ে বাংলার লোকায়ত গবেষণার একটা দিক উন্মোচন হচ্ছে সেই সময়। এই উন্মোচনকে নিজের রচনায় তুমুল ভাবে কাজে লাগালেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে সমকালীন সময়ের নানা রেফারেন্স। যেমন রং-বেরং নাটিকার দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে অবন ঠাকুর লিখলেন (ইন্দ্রের স্মোকিং রুম। ফিট-ফাট বেশে ইন্দ্র। সান্ধ্য-বেশে, কেউ ড্রেস সুট, কেউ পাঞ্জাবি ইত্যাদির বিচিত্র বেশে দেবগন। ঘরের দেয়ালে ইন্দ্রের রাজা বাহাদুর বেশে মাথায় পালক, বুকে তকমা ও চারপাশে দেওয়া অয়েল পেন্টিং।) আমরা পরিস্কার দেখতে পাই ঠাকুর বাড়ির মহারাজাদের বা রায় বাহাদুরদের একটা ছবি যেন আমাদের সামনে উঠে আসতে চায়। সঙ্গে তাঁদের স্মোকিং রুম ইত্যাদি। এই কাহিনীতে চন্দ্র হাত ঘড়ি দেখে সময় বলে, দেবীদের সঙ্গিনীরা মনে করে রাম লীলা বা কেষ্ট যাত্রা দেখলে পুন্যি হত, কিন্তু থ্যাটার অশ্লীল, এখানে ড্রপ সিন ওঠে আর শুম্ভ নিশুম্ভ যথাক্রমে 'প্রমটার' এবং ম্যানেজার হয়। এই বিষয়ের

অভিনবত্ব আমাদের অবাক করে আজও। ১৩২৭ সালের ভারতী পত্রিকায় এই লেখা প্রকাশ পায়।

নোয়ার কিস্তি জুড়ে উঠে আসে বাইবেল, হজরত, পাদ্রী, রেভারেন্ড, নোয়া, ফাদার, মোল্লা, 'আলায়হেস-সালাম' শব্দ এবং চরিত্র ছাড়াও অনেক শব্দের আশ্চর্য 'বাঙ্গালা' করণ। যেমন 'Holy Ghost' অবনীন্দ্রনাথের কলমে হয়েছে 'হোলি গোস্ত'। এখানে বাচ্চাদের খেলার মতো করে নোয়ার নৌকোয় ওঠার আগে পাদ্রী বলেন 'রেডি, স্টেডি, অফ' ইত্যাদী। এই নাটিকা ১৩২৭ সালের ভারতীতে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে ১৩২৭ সালেই পার্বণী পত্রিকায় প্রকাশিত রাসধারী নাটিকায় আমরা চমৎকার ভাবে দেখতে পাই গোপালভাঁড় চরিত্রকে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জুড়ে নেওয়া। এখানে সমকালীন সোনার খেলনা, চীনে মাটির পুতুল ইত্যাদির সঙ্গে ঠাকুমার ঝুলি থেকে দুয়ো রানিমাও হাজির হয়েছেন অবলীলায়। বাংলার একটা লোক চরিত্র গোপালভাঁড়কে নাটিকায় শুধু তুলেই আনলেন না অবনীন্দ্রনাথ, পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘুড়ি ওড়ানো, পুতুল বিক্রি করা ইত্যাদি নানা কাজেরও হদিশ দিচ্ছেন এই নাটিকায় যা লেখকের সমকালের চারপাশ থেকে উঠে এসেছিল।

এই ভাবেই নাটিকা রচনার ভেতর দিয়ে বাংলা থিয়েটারের লেখার ভঙ্গিতেও পরিবর্তন এনে ফেলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। নাটকের চরিত্ররা মানুষের অনেক বেশী কাছের এবং চেনা হয়ে উঠলো। তার সাথে সাথে আরেকটা ঘটনা ঘটল। তা হল রামায়ণ পালা যখন লিখছেন তখন কিন্তু রামায়ণের কাহিনীর যে মূল শিরদাঁড়া তাঁকে তিনি পাল্টে দিচ্ছেন না। কিন্তু নাটিকাগুলোতে তাঁর চরিত্ররা বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রেক্ষিতে তাঁর কাহিনীর সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। নোয়া উঠে আসে বাইবেল থেকে, গোপাল ভাঁড় উঠে আসে নদীয়া থেকে, দেবরাজ ইন্দ্র ঢুকে পড়েন ঠাকুর বাড়ির স্মোকিং রুমে, নাটকের চরিত্ররা গেয়ে ওঠে বাঙলার লোক গান, বলতে গেলে সব মিলিয়ে এক অন্য রকম নির্মাণ গুণ তাঁর লেখনীর পাতায় পাতায়।

শিক্ষক পত্রিকায় ১৩২৮ সালে প্রকাশ হয়েছিল ধরাপড়া। এই ধরাপড়াতে অবনীন্দ্রনাথ যে গানগুলো লিখলেন (ব্যবহার করলেন) সেখানে আবার এক আকস্মিক দিক বদল। গানের ভাষায় আমরা পেলাম তাঁর রবি কাকার ছায়া প্রচ্ছায়া। যেমন 'ওই ওপারে ও কার বাঁশি/আপনি বাজে/বিনা কাজে সকাল সাঁজে আপনি বাজে' অথবা 'তোমারি প্রাণের বাঁশরী করিও/তোমারি বুকেরি

সুরে ভরিও/মনে যে তোমারি উঠিছে গান/আমারে শিখায়ো তাহারি তান'। এই ভাষা বলতে গেলে এক অন্যরকম দিক বদল এনে দিল তাঁর নাটকের গানে এ কথা বললে ভুল হয় না। অথচ ছটকু, বড়কু যারা এই সব ওজনদার শব্দের দিয়ে গান করছে। এই বিস্ময়কর অদলবদল আমাদের আশ্চর্য করেছে বারে বারে। আবার এমন অনেক গান আছে যেখানে রয়েছে কীর্তনাঙ্গের ছোঁয়া। সব মিলিয়ে নাটক হোক বা পালা সব জায়গাতেই অবনীন্দ্রনাথ ধরাবাঁধা গণ্ডী থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছেন। এই পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি আজ নানা ভাবে উঠে আসার প্রয়োজন।

১৩৩০ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিলো এসপার - ওসপার পালা। এই পালাটির চরিত্র গুলি বেশ অন্যরকম। যেমন হর্তা, কর্তা, চিত্র, আত্মা ও সঙ্গে অন্যান্যরা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে এই পালার অভিনয় বিপুল প্রসংশা পেয়েছিলো। এর মধ্যে অনেক জায়গায় পরা বাস্তবের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'নাট্যাভিনয়ের সারবস্তু আবিস্কার করে ফেলেছি আমরা। এ ছারা নয়। দেখা যাক এই পথে চলে আর কিছু পাওয়া যায় কি না'। এসপার ওসপার পালার পর অবনীন্দ্রনাথ আরও গভীর ভাবে ডুব দিয়েছিলেন যাত্রা পালা লেখায়। সেদিন তাঁর লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার কিম্বা রবি কাকার প্লে সমস্ত কিছুর ছক ভেঙে নাট্যাভিনয়ের নতুন সারবস্তু আবিস্কার করা। যে কারণে আজকের দিনে আবার অবনীন্দ্র রচনার এই দিকগুলি নতুন ভাবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করা যায়।